গল্প/গদ্য

কুণাল বিশ্বাস

প্রতিপক্ষ

মকরসংক্রান্তির দিন বিকেলে ঘরে ঘরে যখন আতপচালের মিষ্টি গন্ধ হাওয়া কেটে ঘুরে বেড়াচ্ছে একটানা, গেরস্থালীর রুগ্ন ঢেঁকিগুলো থেকে ঠক ঠক আওয়াজ আসছে মা-কাকিমার হাসিকথা বেয়ে খলখলিয়ে, সবে উনুন ধরিয়ে কেটলি বসিয়েছে পিডব্লুডি মোড়ের চায়ের দোকানি টুনি আর চোখ ডলে লাল করে ফেলেছে হাতের তালু দিয়ে, ঠিক তখনই আমাদের পরিত্যক্ত গোয়ালের দাওয়ায় বসে নকুল মিস্ত্রি পুরনো মশলা ফেলে নতুন করে কল্কে সাজছিল ধীরে, যত্নে। আর কেউ ছিল না কাছাকাছি। তার তন্ময়তা ভেঙ্গে দৌড়ে আসে একটি মুরগি, যার পিছনে ধাবমান এক নধর মোরগ। মৌতাত চোখে নকুল হিসেব করে, তার বয়স বাহান্ন হতে আর ঠিক একমাস বাকি।

এখান থেকে অন্যূন আধঘণ্টা দূরে গত ছয়মাস যাবৎ যাযাবরদের একটা তাঁবু পড়েছে। এরা সারাদিন বেতের ঝুড়ি বোনে আর প্রায় রাতে মেঠো ইঁদুর অথবা গোসাপ ধরে ঝলসে খায়। পাশাপাশি খাঁচায় বাঁদর আর বেজী পোষে। শনিবারের হাটে ঝুড়ি বিক্রি করেই যেটুকু ইনকাম! এই যাযাবর ছাউনি পেরিয়ে বাঁদিকে ঘুরে মিনিট পনেরো হাঁটলে রেলকলোনির বস্তি। রেললাইনের দু'দিকে প্ল্যাটফর্মের সমান্তরালে একেকটি একচালা ঘর চিরুনির দাঁড়ার মতো পরস্পর গা লিপ্টে আছে। দেখে মনে হয় নিরবচ্ছিন্ন এক জনসমবায় রেললাইনকে কোলবালিশ করে প্ল্যাটফর্মের দু'ধার বরাবর সরলরেখা হয়ে শুয়ে রয়েছে। নকুল এই বস্তিতে থাকে। একা একাই থাকে। আজ সাত বছর হয় টগর চলে গেছে। টগর, অর্থাৎ টগরবালা, অর্থাৎ নকুলের সুস্থ ডাগরবৌখান মারা গেছে দু'হাজার দশের বর্ষায়, হাড়কাঁপানো হঠাৎ জ্বরে। বোধহয় ডেঙ্গুই ছিল। তার আগের বছর, দয়াল সহায়, মেয়েটারে পার করা গেছিল। নকুলের বেয়াইঘর দত্তপুকুর। সেটিও রেলকলোনি। তবে উন্নত বস্তি। এ নিয়ে নকুলের সামান্য গর্ব ও নিশ্চিন্তি অনেকেই বুঝতে পারে। কখনো বাড়াবাড়ি করলে অন্য হকারদের কাছে মুখঠাপ খায় হাসতে হাসতে।

আজ রবিবার। সরকারি ছুটি মোতাবেক নকুল এদিন ট্রেন ধরেনা। বাকি ছ'দিন পাঁচ টাকার প্যাকেটভর্তি বাদাম আর কাঁচালঙ্কা নিয়ে বনগাঁ-ক্যানিং লোকালে ওঠে। স্টক খালি করে ফিরে আসে রাত ন'টায়। আর কাজ ফাঁকির এইদিনে গ্রামের কোনো কোনো শৌখিন মালকিন ডেকে পাঠায় ফুলবাগানের বেড়া বাঁধার জন্য। বাঁশের চটা চেঁছে, যদ্দূর হয় সমান করে পরপর আড়াআড়ি আর লম্বালম্বি সাজিয়ে বেড়া বাঁধে। দুপুরবেলা ভাত পায় আর দিনমানে দেড়শ টাকা হাতে করে কলোনিতে ফেরে। এমনই এক রবিবার পাশের বাড়ির ডালিয়া ফুলের বাগান ঘিরে এসে শ্রান্ত নকুল আমাদের গোয়ালের দাওয়ায় বসে জিরোচ্ছিল আর গাঁজা টানছিল। আরও আধঘণ্টা মতো ঝিমোনোর পর টাইমকলের জলে চোখ ভিজিয়ে সন্ধের ঠান্ডা হাওয়া ঘাড়ে লাগাতে লাগাতে বাসার দিকে পা চালাল। গলার নিচ অব্দি তেতো কষে ভরা। কলোনিতে ফিরে চিনিগোলা জল খেয়ে শেষদান ছিলিম টানবে। মনে মনে ছকে নিল একবার।

গোয়াল থেকে বেরিয়েই একটা হাড়গিলে জিওল গাছ চোখে পড়ে। তার গোড়ায় একটি উঁচু গোবরের স্তূপ। কিছুক্ষণ আগে দেখা মোরগটি, তারও মুহূর্তকাল আগে দেখা মুরগিটিকে সঙ্গে নিয়ে এখন গোবরচূড়ামণি, রতিসুখে কাহিল। গলা ফুলিয়ে কোঁকর কোঁক আওয়াজ করে। দু'পায়ের রুষ্ট নখে কালচে গোবর টেনে তোলে ওপরে। এই প্রান্তিক দৃশ্যের কাছে এসে নকুল মুহূর্তক্ষণ চুপ থেকে ফের হাঁটতে শুরু

করে। চারিদিকে জবাক্ষেত। তারপরেই নাব্যজমি আর আটপুকুরি বিলসহ বিঘাদশেক ভূমি চিৎ হয়ে শুয়ে আছে। জবাগাছের উচ্চতায় এপার থেকে বিলের জল ইতস্তত অদৃশ্য হয়েছে কখনো। মরসুমি বক বিলের ভিতর ছড়ানো চালতা, খেজুর, জামরুলের মগে আবাসিক হয়ে আছে বিগত দুই মাস। এই খন্ডনিসর্গের ভিতর দিয়ে হেঁটে বিল ছাড়িয়ে যাযাবর পট্টির কাছে আসে নকুল। মরাকান্না! একটি মহিলাকণ্ঠ থেকে উড়ে আসছে। গলাফাটা চিৎকার, অবোধ্য হলেও তা যে ক্ষিপ্র দোষারোপ, নকুল টের পায়। মদ্দাটা, তাঁবুর দলপতির সরাসরি উস্কানিতে বৌয়ের চুলের মুঠি ধরে ঝাঁকাচ্ছে, পিঠে দুমাদুম লাথি চালাচ্ছে...আর তাদের চার বছরের ছেলে ভীরু চোখে মদ্দা হওয়ার গুরুতর পাঠ নিচ্ছে বাপের থেকে...সদ্য ভাইহারা সে...থেকে থেকে কেঁদে উঠছে...

কী ঘটনা? চালবাজারের মুৎসুদ্দি বলল, বাচ্চা নেছে শিয়ালে।...শোয়ায় থুয়ি মাগি মুত্তি গেছিল বোধায়...সেই ফাঁকে...কোনোভাবে...

একথা শুনে নকুলের মন খারাপ হওয়ারই কথা। সে স্নেহপ্রবণ, দুর্বলহৃদয়। কিন্তু আপাতত পাতার ঘোরে এক সীমাহীন নির্লিপ্তি ছেয়ে আছে মাথার ভিতর। কানে ঢোকে না কিছুই, অথবা ঢুকলেও ভাবনা তৈরি হয়না। একটু দাঁড়িয়ে আবার বাঁদিকে বেঁকে কলোনির দিকে চলা শুরু করে। ঘরে ফিরে একশো ওয়াটের বাল্ব জ্বালিয়ে গুছিয়ে বসে খাটের উপর। একটু পরেই লাগোয়া ঘরের মালতী ফিরবে। মাগী বড় দজ্জাল, অল্প বয়সেই বর খোয়ানো ছেনাল। চামড়া আর টান হয়না, মাই ঝুলে গেছে। এখনও নাকি এক গুপ্তনাঙ পোষে, একথা নকুল লোকমুখে বহুবার শুনেছে। অনেকে নাকি ভোররাতে বেরোতেও দেখে। শুধু মালতীর মুখের ভয়ে কেউ হাতেনাতে ধরার সাহস পায়না। মাসের প্রত্যেকদিন ওর ডিউটি থাকে দমদম স্টেশনে সুলভ শৌচাগারের মহিলা বিভাগে। বেঁচে থাকতে বুড়ি শাশুড়ি ঝামটা দিত, "রাজ্যের মেয়েছেলে ইটে বসে হোগা ছড়ায়ে বালতি বালতি মোতবে...মাগী দিনভর তাই পাহারা দেবে...এই গুদিয়ালির জন্য ব্যাটা আমার অকালে মল্ল..."

টগর থাকতে মালতীর শাশুড়ি মাঝেসাঝে দু-একবেলা খেতে পেত এঘর থেকে। একবার বিউলির ডাল আর বকফুলের বড়া খেয়ে বুড়ি সে কি খুশি! বালিশে মাথা দিয়ে উপরে ঢেউটিনের দিকে তাকিয়ে নকুল ভাবতে থাকে এসব। সধবা টগর আজ বারবার ফিরে আসে দু'চোখের মাঝ বরাবর। স্মৃতি বড় চুতিয়া। ঠিক যেন এক বুড়ো কচ্ছপ। শক্ত খোলে ঢাকা। মাঝেমাঝে মাথা বের করে অবাক করে দেয়। ফের মাথা ঢুকিয়ে নেয়।

বাল্বের উপর একটা পূর্ণবয়স্ক গঙ্গাফড়িং এসে বসে। তারই বড় একখানি ছায়া বেড়ার দেওয়ালে পড়ে অবিকল টগরের নাকের মতো দেখায়। আঙ্গুল দিয়ে ছায়ানাক অথবা নাকছায়া ধরতে যায় নকুল। এমন সময় ফড়িংটা উড়ে গিয়ে অন্য কোথাও বসে।
"সুড়সুড়ি লাগে টগর? তাই সরে গেলা?", নকুল হাসে।

হাসতে হাসতে মনে পড়ে সাতভাই কালীতলার মহিমকে। তার প্রথমযৌবনের বন্ধু। একসাথে উঠত সকাল সাতটা দশের ডাউন বনগাঁ লোকালে। নকুলের হাতে লেবুলজেন্স, মহিমের ঝোলায় মদন কটকটি। দিনের শেষে একসাথে ইছামতীর ঘাটে বসে বিড়ি খেয়ে পোড়া ঠোঁট আরেকটু পুড়িয়ে একসাথে বাড়ি ফিরত দু'জনে। টগরদের ঘর ছিল মহিমদের পাশাপাশি। নকুল, বুড়ো বাপ-মা আর একজোড়া পোষা কুকুর নিয়ে তখন থাকত বনগাঁর গেটপাড়ায়। টগরের দিকে হয়তো মহিমেরও চোখ ছিল। প্রথমবার নকুলের মনোভাব আঁচ করে তাই ম্যাদামেরে গেছিল। নকুল জন্মভোদা, বুঝতে পারেনি। একবছরের মাথায় মদনের বিয়ে হয়, বছর ঘুরতেই ছেলে। নকুল তখনও ডুবে আইসক্রিমওলার ছোটোমেয়ে টগরবালায়।

নকুল বিয়ে করার কিছুদিন পর ওর বাপ, তার কয়েকমাস পর মা মারা যায়। প্রিয় কুকুরদুটো মহিমকে দিয়ে টগরকে সাথে নিয়ে চলে আসে চাঁদপাড়া স্টেশনলাগোয়া এই রেলকলোনিতে। পরবর্তী জীবন একেবারেই নিজস্ব। রুজির জন্যে প্রথমে ঢোকে চিরুনি কারখানায়। অনিবার্য কারণে কারখানা বন্ধ হয়ে গেলে বাধ্যত, নকুল আবার ফিরে আসে ডাউন সাতটা দশে, বাদাম আর বুটভাজাসমেত।

খেজুরপাতার মাদুর পাতা খাটে শুয়ে ঘন্টাখানেক হয় নকুল ঘুমিয়ে গেছে, অথবা ঘুমায়নি। চোখ বন্ধ করে হিটকি মেরে স্বপ্ন দেখছে। নিজেরই ঘুমের ভিতর ঢুকে পড়ছে গুপ্তচর হয়ে, যেখানে রয়ে গেছে গির্জার ঘন্টা আর ফার্স্ট ট্রেনের হুইসল, থ্যাবড়া সিঁদুর পরা টগরের ঘর নিকোনোর সকাল, বঁটি, ছাইমাখা তেলাপিয়া, রেলকলোনির ঘা ওঠা চাঁদ, হকার উচ্ছেদ অভিযান, এস.ইউ.সি.আই.এর পথসভা, পাঁচ দফা দাবি আর এক কাঁদায় ভরা পুকুর যার ওধারে টগর দাঁড়িয়ে আছে আর মিহি গলায় নকুলকে ডাকছে। নকুল ঝাঁপ দেয় পুকুরে, সমূহ পাঁকে। বেশ বুঝতে পারে কাদামাটির হিংস্রতা। প্রবলভাবে তলিয়ে যেতে থাকে।

“ও কাকাআআআ, ঘরে আছো? সন্ধেবেলা গাঁড় উল্টে শুয়ে আছো? ও কাকাআআআ?”...
শব্দপ্রাবল্যে ধড়মড় করে উঠে বসে নকুল। দরজা খোলে। কপালে, গলায় ঘাম।
“কাকা চলো, কলব্রিজ খ্যালব। ঘোঁতন শুঁটকি চাপাইছে।...”
“তোরা এগো। আমি যাচ্ছি।”
“শরীর খারাপ কাকা?”
“রাতে ঘুম হয়নাই কালকে। আসতিছি। তোরা যা।”
“মেয়েছেলে ঢুকাইছ নাকি ঘরে?”, কালা খ্যা খ্যা করে হাসে আর নকুলরে ঠেলে ভিতরে উঁকি মারতে চায়।
“তোর মায়রে ঢুকাইছি খানকির ব্যাটা...”
“ও কাকা, রাগো ক্যা? ঠেকে আসো...” পাপাই সজোরে নকুলের দুধের বোঁটা টেনে দৌড় দেয়।

রাগত নকুল দরজা আটকে এককোণে রাখা প্ল্যাস্টিকের কৌটো খুলে আধমুঠ চিনি বের করে বাটিতে ফেলে। জগ থেকে জল ঢালে বাটিতে। তৈরি ছিলিমে আগুন দিয়ে বড় দুটো টান মেরে থিতিয়ে যায়। চুকচুক করে চিনিজল গেলে। কিছুক্ষণ পর ফের দরজায় টোকা। একাধিক মুখের গুঞ্জন।

“কাকা করো কী?...গাব-জ্বাল দাও?...বাইরে আসো তাড়াতাড়ি...”, পাপাইয়ের গলা।

“কাকা কি মাগী আনে তোল্ল নাকি?”, কালা চিন্তিত।

“শাউয়া! এবার দরজা লাথোয়ে ভাঙবো!...”, গান্দা মুখ ঝাঁকিয়ে ঘোঁতন হুঙ্কার দিল।

ছিলিম নিভিয়ে শান্তভাবে দরজা খুলে নকুল লালচোখে তাকায়।

“চল...খেলে আসি একদান...এট্টু বেশিই পাতা খায়ে ফেলছি...চার ছিলিম শেষ...ভিতরে বিচি রয়ে গেছিল বোধায় ”

“মুখ দিয়ে তো এখনও চ্যাটের ধোঁয়া বারোয়...শরীর ঠিক লাগে তো?”

“হ্যাঁ রে ভোদার বাল...চল...আগা...”

একটা বহু পুরনো লম্বা তালগাছ। নিচে বস্তা পেতে দখল নিয়েছে একদল তাসাড়ু। রেললাইন আর কলোনির থেকে সমান দূরে কিছুটা জায়গা ছেড়ে পলিথিন পেতে আরেকটা দল আরামে বসেছে। এরপরে চারজন লোক বসার মতো উপযুক্ত জায়গা খুঁজে নকুলকে নিয়ে তৃতীয় শক্তি হিসেবে ধপ করে বসে পড়ল সবাই। লাগোয়া ঠেলাগাড়িতে ফুটন্ত তেলে একের পর এক বেগুনী নামাচ্ছে ভোলা। তার পাশে ডেকচিতে শুয়োরের কারি নিয়ে বসে আছে রতন। এই সময়ে তার খদ্দেরের ঘনত্ব সবচেয়ে বেশি। অধিকাংশ চোলাইখোর, এমনকি বাংলা, রাম, হুইস্কি, ভদকা কেনা কাউন্টার ফেরত লোকজন রতনের কাছ থেকে মাংস কিনে নিয়ে যাচ্ছে। তিন পিস পনেরো টাকা। সাথে পেঁয়াজ, লঙ্কা, আদাকুচি। বেগুনিতে কামড় বসিয়ে অবসর নেওয়া এক প্রাজ্ঞ তার সদ্য চাকরি পাওয়া ভাইপোকে জীবনবিমার অনুপুঙ্খ পাঠ দিচ্ছে। সাইকেল গ্যারাজের টিনের দেওয়াল বরাবর এক পেঁচি মাতাল মুততে গিয়ে দু'পা ভরে বিষপিঁপড়ের কামড় খেয়ে ককিয়ে উঠল। সেদিকে উদাসীনভাবে এক পলক দেখে নিয়ে কাকা আবার ভাইপোকে বোঝাচ্ছে মিউচুয়াল ফান্ডের গুণাগুণ, ইনকাম ট্যাক্স ফাঁকি দেওয়ার সূক্ষ্ম ফিকির।

বিকেলে দেখা যাযাবর ছাউনি এখন শান্ত। খড়কুটো জ্বলছে এখানে-ওখানে। বৌ ঠেঙিয়ে অবসন্ন পুরুষটি আপাতত চুল্লুর ঘোরে ভুলভাল বকছে আর খৈনি ডলছে হাতে। ছেলেটি বাপকে দেখছে দূর থেকে। নাকের ডগায় শিকনি শুকিয়ে শক্ত হয়ে লেগে।। বাপের কাছে ঘেঁষতে সাহস হচ্ছে না। সংলগ্ন চালবাজারের প্রতিটি দোকান খোলা। বিকেলের ঘটনাও সবাই জানে। আশ্চর্য! আধমরা মেয়েছেলেটিকে তাঁবুর কোত্থাও দেখা যাচ্ছে না। ভ্রূ কুঁচকে দলপতি পায়চারি করছে দ্রুত আর বৌটির উদ্দেশ্যে মুখখিস্তি করে যাচ্ছে।

কলব্রিজ শেষের দিকে। শালপাতায় মাখামাখা গরম শুঁটকি নিয়ে এসছে ঘোঁতন। চারটে প্লাস্টিকের গ্লাসে ঢালা বাংলা পরিষ্কার জলের চেয়েও পরিষ্কার। এক্সট্রা চাটমশলা বিটনুন ছড়ানো ছোলা। অনিচ্ছা হলেও সবার আবদারে নকুল গ্লাস তুলে ঢোঁক দিল। এক গ্লাস, দুই গ্লাস, আড়াই, পৌনে তিন গ্লাস প্রায় শেষ। হঠাৎ করে প্রতিবেশী তাসাড়ুর দল শো করে দৌড় মারল রেললাইনের দিকে। হইহই শুনে এদিকের সবাই ছুটে গেছে সেদিক। নরম চোখে কয়েকবার দেখে বিষয়টি না ধরতে পেরে ক্লান্ত পায়ে উঠে নকুলও এগোল।

এক অল্পবয়সী মহিলা মুখ থুবড়ে পড়ে আছে রেললাইনের পাথরে। রাতের অন্ধকারে মিশে গায়ের কালো রঙ আরও অস্পষ্ট। চট করে হাত-মুখে লেগে থাকা শুকনো রক্ত কেউ দেখতে পাচ্ছে না। সবাই অনুমানসাপেক্ষ গল্প বানিয়ে চত্বর ভারী করে তুলেছে, সাহস করে কেউই তুলতে আসছে না। নকুল আর ঘোঁতন এগিয়ে গিয়ে বডি তুলে সোজা করা মাত্র জি.আর.পি. ধেয়ে আসল।

"সরে যান সবাই...দূরে যান...পাতলা হন..."
"স্যার, মরে নাই। প্রাণ আছে।"
"হাবড়া জি.আর.পি. থানায় জানাতে হবে। তারপর দেখা যাবে। সরে যান।"

শরীরটাকে ল্যাম্পপোস্টে ঠেস দিয়ে বসাল ঘোঁতন। ল্যাম্পের আলোয় বুকের ওঠানামা বোঝা যাচ্ছে। ব্লাউজ জায়গায় জায়গায় ছেঁড়া। ঠোঁটের কোনায় কালচে রক্ত জমাট বেঁধে আছে। রতনের কাছে চাট কিনতে আসা মুৎসুদ্দি ভিড় দেখে এগিয়ে এল। এই মুখ সে গত কয়েকমাস যাবৎ দেখেছে যাযাবর তাঁবুতে। পুলিশ সম্পূর্ণ নিরুচ্চার। কানে মোবাইল নিয়ে খুব জরুরি কথা বলার আয়াসে প্ল্যাটফর্মের দিকে উঠে গেল আস্তে আস্তে। ভিড় এখন অনেক পাতলা। আদ্ধেক লোক ফুটে গেছে। মেয়েটির নাকের সামনে হাত রাখল নকুল।

“শ্বাস নিচ্ছে ভালোই। ডাক্তারের কাছে নিতি পারলে বাঁচে যাতো। কী কোস ঘোঁতনা?”

“বেকার ঝামেলায় জড়াবা ক্যান বাঁড়া?”, ঘোঁতন ফুঁসে ওঠে।

“আরে ভোদা, যদি তোর ঘরের কেউ হত!”

“গুদ মারাও...আমি চললাম...”

“কাকা, এখন কাছাকাছি ডাক্তার কেউ নাই। এক কাছে সোমনাথ সাহা।”, পাপাই বলল।

“ও চোদনার হোমেপ্যাথিতে কাজ হবে না। চ, হসপিটালে নিয়ে যাই!”

“তোরা গেলে যা...আমি এই খ্যাপাচোদার সাথে নাই...” ঘোঁতন হাঁটা দিল।

নিচে বসা মেয়েটা হঠাৎ যেন নড়ে উঠল। জিভ বের করে গোঙাচ্ছে। মনে হয় জল চাইছে। এখন, এই মুহূর্তে নকুল, কালা আর পাপাই ছাড়া কেউ নেই মেয়েটির কাছে। মাল খাওয়ার সময়ের আধ খাওয়া জলের বোতলটি নিয়ে ঢাকনা খুলে মেয়েটির মুখে ধরে নকুল। অনেক কষ্টে মেয়েটি সামান্য জল খায়। পাপাই বোতলটি নিয়ে চোখে জল ছিটিয়ে দেয় একটু।

“পাপাই, চ আমরা মিলেই হসপিটালে ভর্তি করে দিয়ে আসিগে। চল...”

“কাকা, এডা পুলিশ কেস। এখনি দ্যাখবা জিআরপি ছুটে আসবে।”

“ধ্যার...বাল আসবে। শালার ভেউড়াচোদা! বালগুলো পাশ কাটায়ে গেছে। চ পাপাই, টোটো ধরি। দশ মিনিট তো লাগবে বড়জোর হাসপাতালে যাতে...চল...যদি বাঁচে যায়!”

তিনজন মিলে মেয়েটিকে দাঁড় করিয়ে টোটো ডাকল। জিআরপি আর দৃশ্যের ভিতর নাই। নকুল নিশ্চিত হয়ে দেখল। কলোনি ছাড়িয়ে টোটো বড় রাস্তায়। একদিকে মেয়েটাকে শক্ত করে ধরে বসে আছে নকুল। উল্টোদিকের সিটে পাপাই আর কালা। টোটো ছুটছে মাঝারি গতিতে। বাঁশঝাড় ফুঁড়ে শুকনো বাতাস এসে লাগছে মুখের ঘামে। নেশালু চোখ জড়িয়ে আসছে নকুলের। পেট খালি। সাতবছর আগের এক রাতের কথা মনে পড়ল হঠাৎ। কাঁপুনি ওঠা টগরকে কাঁথায় মুড়ে ভ্যানে করে হসপিটাল যাওয়ার কথা। আর কেউ ছিলনা সাথে। হসপিটাল পৌঁছবার একদিন পরে একা একাই টগরের মৃত্যু সয়েছিল নকুল। সেদিন আকাশ ছিল মেঘলা। বিরক্তকর বৃষ্টি পড়ছিল। এখন যাকে নিয়ে যাচ্ছে সে অনাত্মীয়া। কোনোদিন চোখেও দেখে নাই। একটু ধাতস্ত হলে নকুল ওর নাম জানতে চাইল। বহুকষ্টে বিড়বিড় করে অবাঙালি উচ্চারণে বলল - বিন্দু বাউরি। তারপর আবার নেতিয়ে পড়ল।

বিন্দু যদি সুস্থ হত, বোধগম্য বাংলায় কথা বলতে পারত এবং সর্বোপরি আত্মজীবনী উগরাতে পারত স্বেচ্ছায়, তাহলে নকুল জানতে পারত অনেককিছু। ওর বাড়ি ছিল বাংলা-ঝাড়খন্ড সীমান্তের কাটিং চকে। বিয়ে হয়েছিল তেরো বছরে। বর ভাগচাষী; বহুটাকা দেনা মহাজনের কাছে। বাড়িটি অব্দি বন্ধক ছিল। ভেট হিসেবে নিজের বৌকে দিতে হয় মহাজনের কোঠায়। স্বয়ং মহাজন, তার দুই ভাই, গাড়ির ড্রাইভার, শেষে বাড়ির চাকর সহ মোটমাট সাতজন মিলে ফালাফালা করে বিন্দুকে। একটানা দু'মাস। তারপর লাথি মেরে তাড়িয়ে দেয় যথারীতি। শ্বশুরবাড়ি, বাপের ঘর কোথাও জায়গা হয়না। ততদিনে পেটে বীজ

এসে গেছে। এ বাচ্চা কার - ওর বরের, মহাজনের, মাদারি দুই ভাইয়ের, নাকি ড্রাইভারের, না চাকর অবিনাশের – বিন্দু জানত না। হাটে কেনা ইঁদুর মারা বিষ খেয়ে পড়েছিল কালভার্টের পাশে। ঘুম ভেঙে দেখে সে এসে পড়েছে পাশের রাজ্যে, পুরুলিয়া জেলায় - কুস্তাউর বলে একটি ছোট্ট জনপদে এক যাযাবর তাঁবুতে। এর ন'মাস পড়ে একটা ছেলে প্রসব করে বিন্দু। সেই ছেলেসহ তাকে নিয়ে তাঁবু থেকে একদিন পালিয়ে যায় সানিচরণ। ছ'মাস এখানে ওখানে অস্থানে কুস্থানে কাটিয়ে শেষে গিয়ে ভেড়ে এক অন্য তাঁবুতে, এই যাযাবর দলে। দু'বছরের মাথায় আবার ছেলে হয় বিন্দুর। তখন ওর বয়স সতেরো।

যুগ্ম নেশার ঘোরে একাধারে ভাবালু আর দার্শনিক হয়ে উঠেছে নকুল। বাঁহাতে বিন্দুকে শক্ত করে ধরে বসে আছে। আকাশের বুকে আজ অসংখ্য তারা উঠেছে নির্ভয়ে। টগর কি সেখান থেকে নজর রাখছে? রাগ করছে নকুলের উপর? ধ্যার! তা কেন? বিন্দু বাউরি হাঁটুর বয়সী, মেয়ের মতো! আচ্ছা, টগর কি নতুন কোনো ব্যাটাছেলে পেয়েছে স্বর্গে? মেঘের ভেলায় চড়ে ঘুরে বেড়ায় মাঝেমাঝে? পেট্রাপোল দেখতে পায়? ফরিদপুরের বাড়িতে ঢুকে পড়ে উপর দিয়ে? কবি হয়ে গেল নাকি ল্যাওড়া! নকুল মনেমনে ভাবে। বিন্দু কি অজ্ঞান হয়ে গেছে না ঘুমোচ্ছে? কেমন টাইপের মেয়েছেলে বিন্দু? টগরের মতো সতীলক্ষ্মী নাকি মালতীর মতো বারমুখো খানকি? যাই হোক, সবার উপরে সে এট্টা ন্যাতায়ে পড়া শরীর। ডাক্তারের কাছে পৌঁছাতেই হবে। বিন্দু যদি মরে যায়, তাহলে পুলিশ কেস হবে নির্ঘাৎ! ঘোঁতন সাবধান করসিল। নকুল এট্টু এট্টু ভয় পায়। কাল আর ট্রেন ধরা হবে না! পাপাই আর কালা চুপ করে মোবাইল টিপছে। উটকো ঝামেলা নেওয়ার জন্য নকুলের উপর বেদম খচে।

খুব আস্তে শাঁআআআ শব্দে টোটো চলতে থাকে। এই একই শব্দ আরও গম্ভীর শোনা যায় ট্রেন চলার সময়। আর পাঁচ মিনিটের ভিতর হসপিটাল এসে যাবে। টগর মারা যাওয়ার পর থেকে যেকোনো হসপিটাল চত্বর এড়িয়ে চলে নকুল। অদ্ভুত জায়গা এক! টগরের ডেডবডির দিকে ফ্যালফ্যাল করে যখন তাকিয়ে ছিল, একটু দূরে তখন নতুন বাচ্চা হওয়ার ফুর্তি। পেশেন্টপার্টি মিস্টি খাওয়াচ্ছে নার্স আর আয়াদের। সেদিন যত বাচ্চা পয়দা হয়েছিল সবার বয়স এখন সাত। শুধু হসপিটাল কেন, কোর্টকাছাড়িতেও নিশ্চয়ই এরকম হাসিকান্না চলতে থাকে। কারো যাবজ্জীবন, কেউ বেকসুর। বিন্দু মাথা হেলে দিয়েছে নকুলের কাঁধে। পাপাই আর কালা এখনও মোবাইলে ডুবে। নাহলে পোঁদে লাগত।

নকুলের খেয়াল হয়, সে এতদিন জীবন আর মৃত্যুর মাঝামাঝি এক অসহায় অস্তিত্ব বয়ে নিয়ে চলেছে। এই যে আধমরা বিন্দু বাউরি, এক পাঁইট বাংলা খাওয়া কালা আর পাপাই, চার ছিলিম গাঁজা আর পৌনে তিন গ্লাস বাংলা খাওয়া সে নিজে, তার কাঁধে মাথা দেওয়া এক রাতকালো শরীর - সবাই বেঁচে আর মরে আছে। জীবিত নকুলের সঙ্গে একইসাথে বাস করছে এক মৃত নকুল। দুজনেরই সময় নির্ধারিত, শুধু আগে আর পরে। একই দেহে তাদের মথুরা-বৃন্দাবন। জ্যান্ত কালা, জ্যান্ত পাপাইয়ের দেহে ঘাপটি মেরে আছে এক পিস মৃত কালা, এক পিস মৃত পাপাই। জীবিত বিন্দুর ভিতর ওৎ পেতে আছে এক মৃত বিন্দু। আজব চিজ এই মৃত্যু। সবসময় দাঁত কেলিয়ে আছে। হাভাতের মতো ঘুরে বেড়ায় এধারওধার। যাকে খুশি চুদে দেয় যখন-তখন। মৃত্যুর দিকে তাকিয়ে ঠিক একইভাবে দাঁত ক্যালানো উচিত। ভাবতে গিয়ে হেসে ফেলে নকুল।

একটু দূরে গ্লো সাইনবোর্ডে দেখা যায় 'চাঁদপাড়া ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র'। টোটো গিয়ে দাঁড়াল কম্পাউন্ডের ভিতর জামগাছতলায়। পাপাই গিয়ে ভিতরে খবর দিলে দু'জন স্ট্রেচার নিয়ে এগিয়ে আসে টোটোর কাছে। তিনজন মিলে বিন্দুকে চিৎ করে শুইয়ে স্ট্রেচার নিয়ে ভিতরে চলে যায়। ডাক্তার হয়ত একটু পরে আসবে। তোলার সময় বিন্দুর শ্বাস নিয়মিত পড়ছিল ভেবে খানিক নিশ্চিন্ত হয় নকুল। ডাক্তার মনে করলে দরকারে অক্সিজেন দেবে ঠিক। যদি অবস্থা খারাপ হয়? বনগাঁ পাঠাবে? এতরাতে? এ্যাম্বুলেন্স পাওয়া যাবে? যেকরেই হোক মেয়েটিকে বাঁচাতে হবে। সাতবছর পর মৃত্যু আবার নকুলের কাছে, অন্য কারো মাধ্যমে। এবার জিততেই হবে।

তিন ঘন্টা পার হয়ে গেছে। বিন্দু এখন একটু ভালো। ডাক্তার এখানেই ভর্তি করে নিয়েছে। কাল সকালে ওর সাথে কথা বলে বাড়ির ঠিকানা জানা দরকার। পাপাইয়ের কাছ থেকে দেশলাই নিয়ে একবার থুতু ফেলে নকুল বিড়ি ধরায়। তারপর পাঁচিলের আড়ালে গিয়ে ঠ্যাং ফাঁক করে অনেকটা পেচ্ছাপ করে এসে জামগাছতলার বাঁধানো বেদীতে বসে গাছে ঠেস দিয়ে গা এলিয়ে দেয়। কানের কাছে মশা গুনগুন করে যাচ্ছে একটানা। ঘুম পায়; ঘুমের ঘোরে চোয়াল শক্ত করে নকুল এক গাঢ় নীল আবছায়ার পাঙ্গা নেয় প্রবল রাগে। প্রথমে হারে, তারপর জেতে। খেলা এক-এক ড্র হয়। শাঁখা-সিঁদুর পরা টগর এসে গলায় রজনীর মালা, কপালে জয়তীলক পরিয়ে দেয় স্বপ্নে। সান্ত্বনা পুরষ্কার মনে করে নকুল মনে মনে হাসে।

বাইরে আকাশের দিকে চেয়ে আড়মোড়া ভেঙে মাঝরাত্রি হাই তুলছে নিঃশব্দ সোডিয়াম আলোর উপর। হলুদ আলোয় মিশে গেছে ধোঁয়া ধোঁয়া কুয়াশা। ঘুমে চুর নকুলের মাথার ভিতর তৈরি হচ্ছে এক আলুথালু চাঁদ। তার থেকে দুধফেনার মতো স্বাভাবিক কিছু জ্যোৎস্না ধীরে ধীরে গড়িয়ে পড়ছে ওর মুখের ওপর।

Copyright © 2019 Kunal Biswas Published 1st Nov, 2019

কুণাল বিশ্বাস বিনয় মজুমদারের স্মৃতিপুষ্ট ঠাকুরনগরে লেখকের বাড়ি। পেশায় রাজ্য সরকারী কর্মী - পূর্ত দপ্তরের ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ার। আসল প্রেম অঙ্ক, মূল অভিনিবেশ কবিতা। যদিও গদ্য লেখায় স্বচ্ছন্দ বেশি। আগে দু-একটি অনলাইন পোর্টাল, খবরের কাগজ (এই সময়) এবং পত্রিকায় কিছু গদ্য, গল্প, প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। আপাতত কোনো বই নেই।